অপেক্ষার ট্রেন

আজহার শাহিন

ঐতিহ্য

সূচি

অচেনা একজন ৯
অপেক্ষার ট্রেন ১৪
বিচার ১৮
গ্লানি ২৪
বৃত্তের ভেতর ২৯
খড়ের চালাঘর ৩৩
রিজাইন ৩৯
আলো-অন্ধকারে যাই ৪৪
ঘুম ৪৮
কদম ফোটা বৃষ্টি ৫২

অচেনা একজন

তাকে কেউ চিনতে পারেনি। গ্রামের রাস্তার একপাশে বসতবাড়ি, অন্যপাশে ফসলের মাঠ। মাঠ চিরে একটি রাস্তা চলে গেছে ছোট নদীটির দিকে। প্রায় সারাবছর এর পানি পায়ের পাতা পরিমাণ থাকে। নদীর তীরে প্রচুর গাছপালা ঘন হয়ে আছে। নীরবতাকে এখানে সঙ্গ দেয় পাখির ডাক। ঘুঘুর চঞ্চলতা গাছের সবুজ শাখায় দোলা দিয়ে যায়। একপাশে পুরাতন কবরস্থান। একটু দূরে হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে খিল জমিতে ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। মাঝেমধ্যে তাদের কোলাহল নদীর তীরের নিস্তব্ধতায় নাড়া দিয়ে যায়।

আহসান কবির উঁচু রাস্তা থেকে নেমে এলেন মাঠের আইল ধরে। তিনি যেন নেমে যাচ্ছেন সময়ের গভীরে। পথঘাট অনেকটা বদলে গেছে। তাকে চিনবে এমন লোক দেখা যাচ্ছে না। চল্লিশ বছর পর তিনি এলেন এই গ্রামে। কম বয়সিরা তাকে চেনার কথা না। তাকে মনে রাখবে এমন প্রবীণ গাছও আশপাশে নেই। বয়স্ক এক আগন্তুককে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখে এগিয়ে এলো ক্রিকেট-খেলা তরুণদের একজন। আহসান কবির তার সাহায্য চাইলেন। তরুণটি দেখতে পেল তাঁর হাতে ফুলের তোড়া, সকল ফুল সাদা। তিনি কবরস্থানে যাবেন। এই গ্রামে কবরে ফুল নিয়ে যাওয়ার মতো কাউকে এখনো দেখেনি তরুণ। ফলে তার মধ্যে কৌতূহল জাগল।

পারিবারিক কবরস্থান। আত্মীয়-পরিজনদের বড় পরিবারের সদস্যরা প্রায় শত বছর ধরে এখানে শায়িত হয়েছেন। আহসান কবির নির্দিষ্ট একটি কবরের কাছে এগিয়ে গেলেন। নামফলক দেখে প্রাচীন

কবরের পাশে বসে পড়লেন। একটু দূরে দাঁড়ানো যুবক বুঝতে পারছে না, লোকটি কে। তিনি বসে আছেন। একটু কি আবেগাক্রান্ত? বেরিয়ে এলেন কবরস্থান থেকে। সাথে হাঁটছে যুবক। বিনয়সহ জানতে চাইল, 'আপনি কি আমাদের আত্মীয় কেউ?'

আহসান কবির তরুণের দিকে মনোযোগ দিলেন। তার নাম হিমেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে চাকরির চেষ্টা করছে। তার পিতা স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন অবসরে আছেন। প্রশ্নের জবাব এককথায় দেওয়ার মতো উত্তর তার কাছে নেই। এত বছর পরে আত্মীয়তার পরিচয় দিয়ে কথা বলা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক দেখায় না। তবু তাকে পরিচয়টা দিতে হবে। তিনি নিজের নাম বলে জিজ্ঞেস করলেন, এই নামে কাউকে চেনে কি না। যুবক আগে কিছুটা আন্দাজ করেছিল। এবার বলল, 'আপনি আমাদের ফুফা হন।'

বিকেলের আলো কমে আসছে। তরুণ আগন্তুককে নিয়ে বাড়িতে যায়। উঠানের একদিকে বাগান। তার পাশে বসার ব্যবস্থা হলো। অনেক কিছু বদলে গেছে। নতুন ঘর উঠেছে। তবে পুরাতন ঘরটি এখনো আছে। টিনের চালের রং গাঢ় খয়েরি হয়ে আছে। তবু টিকে আছে দেখে আহসান কবিরের চোখ ছলছল করে উঠল–একটি মুখ কি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াবে? বহুবছর আগে ঝরে যাওয়া ফুলের সাথে যেন কথা বলতে এসেছেন। বয়সি গাছে ঝড়ের ঝাপটার মতো কাতর তিনি।

চল্লিশ বছর আগে গত হওয়া একজনের স্বামীর পরিচয় নিয়ে আহসান কবির হাজির হয়েছেন তার শ্বশুর বাড়িতে। লিলির হাজব্যান্ড। তরুণের পিতা তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। সময় বদলে দেয় অনেক কিছু, কিন্তু শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে পারে না। প্রবীণ যারা খবর পেলেন, দেখতে এলেন। উঁচা-লম্বা, সৌম্যদর্শন মানুষটির আগের মতোই মাথা ভরে আছে লম্বা চুল। কেবল সংখ্যা কিছু কমেছে, রং রূপান্তরিত হয়েছে সাদায়। বয়স যাদের কম তারা পরিবারের হারিয়ে যাওয়া সময়কে পাঠ করার চেষ্টা করছে। সবার চোখে-মুখে আনন্দ। যেন আহসান কবির নয়, এই বাড়ির মেয়ে

লিলি ফিরে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, বিয়ে হয়েছে ক' মাস হলো।

কিন্তু তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন?

গতকাল দেশে এসেছেন আহসান কবির। লিলির মৃত্যুর বছরখানেক পর দেশ ছেড়ে যান। শ্বশুর বাড়ির সাথে যোগাযোগ তার ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ কী দারুণভবেই না যুক্ত ছিলেন এদের সাথে!

লিলি, ভালো নাম আইরিন সুলতানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে তার কয়েক বছরের জুনিয়র। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে পরিচয়। খুব ভালো গান গাইত লিলি। দুজনের বাড়ি সিলেট জেলায়। ফলে যোগাযোগ তৈরি হতে সময় লাগেনি। মাস্টার্সের রেজাল্ট হতে না হতে চাকরি হলো তার। ব্যাংকের কর্মকর্তা। তারপর একদিন দুজনে সিদ্ধান্ত নিল বিয়ে করবে। বিয়ের প্রস্তাব গেল বাড়িতে। শিক্ষিত ছেলে, ভালো পরিবার–বিয়ে হয়ে গেল। সারা গ্রামের মানুষ দাওয়াত পেল। অনেক ধুমধাম হলো বিয়েতে। লিলি রোকেয়া হল ছেড়ে উঠে এলো আজিমপুরে তাদের নতুন সংসারে।

ছুটির দিনে দুজনে একসাথে নিউমার্কেটে যায়। পছন্দের জিনিস যা পায় নিয়ে আসে, ঘরদোর সাজায়। হানিমুনে গেল কক্সবাজার। সিলেটের চা-বাগানগুলো ইতোমধ্যে ঘোরা শেষ। পূজার ছুটিতে দেশের বাইরে বেড়াতে যাবে ঠিক হলো। এরমধ্যে সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়িতে এলো। সকালে ঘুম থেকে জেগে আহসান কবির দেখে, তার সকল স্বপ্ন আর আনন্দ নীরব হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। কেন, কী হয়েছে লিলির, কেন এই অকাল ঘুম–কিছুই জানা হলো না। কেবল সে সত্যটুকু জানল, একবার কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তাকে আর জাগানো যায় না।

একমাত্র মেয়ের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে গভীর শোক অনেকদিন ঘিরে থাকল। একদিন হয়তো বিস্মৃতি এসে কিছুটা দূরেও ঠেলে দিলো তাকে। কিন্তু আহসান কবির যেন একেবারে হারিয়ে গেলেন। চাকরি

ছেড়ে পাড়ি জমালেন বিলাতে। সেখানে চাকরি করেছেন, ছেড়েছেন। দেশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবার বহুবছর পর ফিরে এলেন।

একসময় এখানে বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধ্যার পরপরই রাত নেমে আসত। এখন বিদ্যুৎ আছে। তবু চারদিকের নীরবতা রাতকে ডেকে নিয়ে আসে। খাবারের পর সবাই বসেছে একসাথে। নানাজন নানাকথা জানতে চায়। পাশের বাড়ি থেকে এসেছে খুরশিদ আলী। এই বাড়িতে কাজ করত। তখন তার বয়স কম। তাকে দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে উঠল। 'কী সুন্দর যে লাগত দুই জনরে। মনে অইত ভাই-বইন।' প্রতিবেশী কাছম আলীর আফসোস, 'আমরারে ভুইল্যা গেলাইন?' ঘরের গৃহিণী জানতে চান, 'আপনি আর সংসার করেননি?' এই প্রশ্ন আহসান কবির এর আগে শুনেছেন, জবাব দিয়েছেন। কিন্তু এই বাড়িতে বসে এর জবাব দিতে পারছেন না। কেবল চেয়ে রইলেন। তার মনে হলো, লিলি কোথাও আছে; এখনই আসবে। সবার সাথে গল্পে যোগ দেবে।

কথায় কথায় রাত বাড়ে। টিনের চালে গাছ থেকে শিশির ঝরার শব্দ হচ্ছে। দূরে কোথাও নিশুতি পাখি ডাকছে। লোকজন কমে আসে। লিলির বড় ভাই কথা বলছেন কম। তিনিই ছিলেন তখন অভিভাবক। বোনটি ছিল তার অনেক আদরের। পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে দ্বিমত করেননি। লিলিও তাকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করত। বয়স যে তাকেও কাবু করেছে, বোঝা যায়।

যখন সবার কথা ফুরিয়ে এলো, আহসান কবির ধীরে ধীরে স্বগতোক্তির মতো বলতে শুরু করলেন, 'এত লম্বা জীবন! একা একা হেঁটে পার করে দিলাম। জীবন থেকে পালাতে পালাতে কখন পার হয়ে গেছি দীর্ঘ পথ। মনে হলো, সময় ফুরিয়ে আসছে। এবার থামতে হবে। আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম। লিলিকে আপনারা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আমি রাখতে পারিনি। আমার হাত গলে ঝরে গেছে। তবে আমি তাকে ফেলে যাইনি, যেখানে গেছি, বুকে করে নিয়ে

গেছি... । আমি একটা ছোট অনুরোধ নিয়ে এসেছি... । লিলির কবরের পাশে আমারে একটু জায়গা দেবেন?' আহসান কবির থামলেন ।

নিকটে বসা ছিল হিমেল । তার মনে হলো, এই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে জড়িয়ে ধরা দরকার ।

অপেক্ষার ট্রেন

গ্রীষ্মের পড়ন্ত দুপুরে আন্তঃনগর ট্রেনের এসি কামরায় উঠতে পেরে মনসুর আলীর বেশ লাগে। গার্ডরা সাধারণত এই কক্ষে যাত্রী ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না। এখানে হকার-ভিক্ষুকের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত। তবুও ফাঁকফোকরে অনাহূত কেউ ঢুকে যায়। মনসুর সেই সুযোগটিই নিয়েছেন। কামরাটি অন্য কামরার মতো নয়। কেউ দাঁড়ানো নেই। দু-একটি আসনও ফাঁকা আছে। মনসুর যাত্রী নন, হকারও নন। তার কাছে বিক্রি করার মতো কিছু নেই। চিপস-বিস্কুট, ছোটদের বর্ণপরিচয়, ধর্মীয় বই কিংবা মসজিদ নির্মাণের সাহায্যের রশিদ বই–কোনোটিই তার কাছে নেই। হাতে একটি পুরাতন দোতারা। তিনি গান করেন। সাধারণত শীতকাল হচ্ছে গানের আসরের জন্য ভালো মৌসুম। বড় শিল্পীদের আসরে তারও ডাক পড়ে। তবে মাঝবয়সি মনসুর আলী তত বড় শিল্পী নন। বড় শিল্পীর অনুপস্থিতিতে হয়তো দায়িত্ব নেন। না-হলে গানের আসরে নামি শিল্পীদের গানের আগে তাকে গাইতে হয়। তবে বাউল গান গেয়েই তার জীবন চলে। ছয় সদস্যের পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে। শীত অতিক্রান্ত। এই সময় গানের ডাক আসে কম। মাজারে, উরসে, কোনো কোনো মেলায় গানের আসর হয়। তবে এসবে এখন আর সংসার চলে না।

বাধ্য হয়ে ট্রেনে আসা। ট্রেনে গান গাইতে তার গায়কসত্তায় বাধে। এখানে অনেক ধরনের মানুষ থাকে। একেকজনের একেক রুচি। তার ওপর কারো ইচ্ছে হলে স্মার্টফোনে গান শুনে নেয়। একজন

লোকগায়কের গানের জন্য কেই-বা অপেক্ষা করে থাকে। এখানে সম্মানীও পাওয়া যায় যৎসামান্য। তবে ভেবে এইটুকু সান্ত্বনা পান যে, গান শুনিয়ে কারো কাছ থেকে চেয়ে টাকা-পয়সা নেন না। কেউ খুশি হয়ে যা দেয়। উপযাচক হয়ে গান শোনাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ইচ্ছের ওপর তো আর জীবন চলে না। চার সন্তানের সবাই ছোট। বড় ছেলেটি মাঝেমধ্যে বাবার সাথে গানের আসরে যায়। একটু-আধটু গাইতে শিখেছে। ডুপকি বাজাতে পারে। বাবার সাথে গায়, কখনো দোহারের কাজ করে। গান একটু সমৃদ্ধ হয়, শ্রোতারা পছন্দ করে। আজ ছেলে তার সাথে ট্রেন এসেছে প্রথমবারের মতো।

এসির ঠান্ডা হাওয়ায় মনসুর আলীর আরামবোধ হবার সাথে সাথে ক্ষুধার অনুভূতিটা জানান দেয়, দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি। আশার কথা হলো মনতলা স্টেশন বেশি দূরের পথ নয়। আধা ঘণ্টায় পৌঁছা যাবে।

মনসুর আলী এসির কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকান। বিভিন্ন পরিবেশে গান গেয়ে তার এই প্রতীতি জন্মায় যে, যস্মিন দেশে যদাচার। লোকাল ট্রেন হলে হয়তো কোনো এক কোণে দাঁড়িয়ে তার মতো করে গান শুরু করে দিতেন। এমনিতে ট্রেনে গান করার সময় একটু জড়তা কাজ করে। হঠাৎ গান শুরু করা যায় না। মানুষের ভিড় থাকে, ট্রেনের শব্দ–সব ছাপিয়ে কণ্ঠ আর যন্ত্রের মিল ঘটানো কঠিন। তবে জীবন তার চেয়েও কঠিন। কঠিন কাজটিই মানুষকে করতে হয়। এসি রুমের পরিবেশটা তার পছন্দ হয়। এখানে সাধারণত যাদের টাকাপয়সা আছে তারা বসেন। মনসুর যাত্রীদের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছেন। কেউ যদি প্রশ্রয়ের চোখে তাকায়, এই হলো আশা। এমন সময় রেলের পুলিশ এসে জোরে ধমক লাগায়–'এই গানঅলা, আবার এখানে আইসো, যাও।' মনসুর অপ্রস্তুত হন–কোথায় যাবে, যাওয়ার জায়গা থাকলে কেউ এখানে আসে? ছেলে বিলাল ভয় পায়। প্রায় চলেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি গান করেন?' মনসুর যেন এই কথারই অপেক্ষায় ছিলেন। এ তো প্রশ্ন নয়, আহ্বান; যেন অনুরোধ! দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে মনসুর জবাব দেন, 'জি সাব!'

সাদা ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি পরিহিত মনসুর গলায় দোতারাটি ঝুলিয়ে তারে টোকা দিলেন। আজ সাথে আছে তার ছেলে। এ হচ্ছে সংগীতের পরম্পরা। মনসুর গান শিখেছেন তার বাবার কাছে। তিনি গ্রামের হাটে গান গেয়ে ওষুধ বিক্রি করতেন। ধর্মঘর, চৌমুহনী, তেমইন্যা, মনতলা বাজারের এক পাশে কোনো খালি জায়গায় ছোট বাক্সপেটরা নামিয়ে গান জুড়ে দিতেন। লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে-বসে গান শুনত, গানের ফাঁকে চলত ওষুধ বিক্রি। ওষুধ বলতে গাছের শিকড়-বাকড়, তাবিজ, দাঁতের মাজন, কৃমির ওষুধ ইত্যাদি। কিশোর মনসুর ছিলেন পিতার সহযোগী, বাজাতেন ডুপকি। আজ সে দায়িত্ব এসে পড়েছে ছেলে বিলালের ওপর। তবে তিনি ওষুধ বিক্রি করেন না। তার জীবন ও জীবিকায় জড়িয়ে আছে গান। বিলাল স্কুলে যায় মাঝে-মধ্যে, বাবার সাথে রোজগারে যেতে হয় বলে পড়াশোনায় নিয়মিত হতে পারে না।

মনসুরের পরিবার, সংগীতের পরিবার। পিতার মৃত্যুর পর মনসুর গান শিখেছেন বাচ্চু বয়াতির নিকট। ওস্তাদ শিল্পী। গানের আসরে মানুষের ঢল নামত। শীতের রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত মানুষ তার গান শোনার জন্য বসে থাকত। বিচ্ছেদ, ছেদা-বিচ্ছেদ, মালজোড়া– শরিয়ত-মারফতের লড়াইয়ে ওস্তাদের জুড়ি মেলা ভার। তার শিষ্য মনসুর। তিনি আজ নেই। তবে তার কন্যা আছে তার গৃহিণী হয়ে। গানে গানে পরিচয়, সংসার। ওস্তাদ নিজের কন্যাকে প্রিয় শিষ্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওস্তাদের মেয়েকে প্রথম দিকে সম্মান দিয়ে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। আজও আপনিতেই রয়ে গেছে। তার স্ত্রীও গান-পাগল মানুষ। অভাব-অনটনের সংসারেও গানের মায়া তাদের ছেড়ে যায়নি। তিনি হয়তো অতি প্রয়োজনে আজ ছেলেকে তার বাবার সাথে পাঠিয়েছেন।

মনসুর গান ধরলেন। বিচ্ছেদ গান। 'আরে ও জ্বালা নিভে না রে'। প্রয়োজন সবচেয়ে বড় প্রেরণার নাম, মানুষের সেরাটা বের করে আনে। মনসুর দরদ দিয়ে গাইলেন। কণ্ঠে পিপাসা, পেটে ক্ষুধা কিংবা অন্তরে অনন্ত বিরহের এক সত্তার জাগরণের কারণেই হোক, তার চোখ ভিজে আসে। সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনের এই শীতাতপ

নিয়ন্ত্রিত কামরায় কিছু মানুষের কানে তিনি বিরহের বেদনা পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলেই মনে হলো। বয়সি শ্রোতা মুগ্ধ হলেন দরদি কণ্ঠ এবং নিবেদনে। তার সামনের খালি আসনটিতে তাকে বসতে দিয়ে আরো একটি গান গাওয়ার অনুরোধ করলেন। মনসুর এবার ধরলেন তার নিজের লেখা গান–'দেহ গড়লায় যতন কইরা/ মনটা করলায় উদাসী/ বুকের ভেতর বাজে সদায়/ বিরহের বাঁশি।'

ছেলে ডুপকিতে তাল দিচ্ছে ভালোই। ট্রেনের শব্দের ভেতরেও মনসুর মুহূর্তটা উপভোগ করছেন। নির্মল এই আনন্দের অনুভূতির জন্যেই তো সব ছেড়ে দিয়ে সুরের সাধনা বেছে নিয়েছেন। তবে গান শেষ হওয়ার আগে আবার আসে রেল পুলিশ। সম্ভবত আজ কোনো বড় অফিসার আছেন ট্রেনে। পুলিশের দুই সদস্য মনসুর এবং তার ছেলেকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে আসে। হরষপুর স্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার আগে অশ্রাব্য ভাষার গালির সাথে হয়তো মনসুরের পিঠে দু-ঘা লাঠির আঘাতও পড়ে। আকস্মিক এই ঘটনায় বাপ-ছেলে হতবাক হয়ে যায়। ছেলে চোখ মুছে, 'দুখ পাইছো আব্বা?' মনসুর মাথা নাড়েন, 'নাহ!' তবে ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। ছেলের কাঁধে হাত রেখে কাছে টানেন। একটু আড়ালে গিয়ে তার দিকে না তাকিয়েই বলেন, 'তুমার মা'রে কইও না গো আব্বা, কষ্ট পাইবো।'

ছোট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নীরব জায়গায় দুইজনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে, যে ট্রেন তাদের ফেলে যাবে না।

বিচার

রহমত আলী বসে আছেন প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে। পথের ধারে বটগাছের তলায় ছোট চায়ের দোকানের পাশে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা বেঞ্চে। বসে থাকতে তার খারাপ লাগছে না। মাঠের ভেতরের আইল দিয়ে, কাঁচা রাস্তা ধরে, পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছেন তিন মাইল পথ। এর মধ্যে কয়েকবার তাকে জিরিয়ে নিতে হয়েছে। রহমত আলী যৌবনে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়েছেন পায়ে হেঁটে। সে অনেক বছর আগের কথা। তিনি এখন বৃদ্ধ। শরীরের ওজন দুর্বল পা আর বহন করতে চায় না। তবু শীতের সকালে একাই এতদূর এসেছেন। আজকের দিনটির জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছেন–চল্লিশ বছর হবে, যেদিন রহমত জানলেন তার চোখের আলো একেবারে নিভে গেছে।

গতকাল রাতে মাইকে প্রচারের মাধ্যমে রহমত জানতে পারলেন রইছ চেয়ারম্যান মারা গেছেন। তার সাথে শেষ দেখা করতে এসেছেন। সকালে বাড়ি থেকে যখন রওয়ানা দেন, তখন বেশ ঠান্ডা। পৌষের শেষ সময়, শীত পড়েছে। হাঁটার কারণে হোক, কিংবা সূর্য উত্তাপ একটু বেশি ছড়ানোর কারণেই হোক, এখন আর তেমন ঠান্ডা লাগছে না। রাস্তার পাশে অনেক বড় খিল জমি। তার এক পাশে পুরোনো কবরস্থান। জানাজার জন্য মানুষজন জড়ো হতে শুরু করেছে। সকাল এগারোটায় নামাজ। মানুষের সাড়া-শব্দ বেড়ে গেছে। অল্প পরেই হয়তো লাশ নিয়ে আসবে মাঠে। রহমত অপেক্ষা করে আছেন দেখা করার জন্য। রইছ চেয়ারম্যানের সাথে চল্লিশ বছর আগে শেষ দেখা। এর মধ্যে আর তার কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

সেদিনের সব কথা তার মনে নেই। তবে কিছু স্মৃতি থাকে, কিছু কথা থাকে কখনো হারায় না; নিশ্বাসের মতো বুকের পাঁজরে লেগে থাকে। তাকে বহন করতে হয় শেষ পর্যন্ত। রহমত তখনো 'রহমইত্যা ডাকাইত' হয়ে ওঠেননি। ছোট সংসার। ছয় বছরের একটি মেয়ে। পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ চুরি-ডাকাতি করত। তরুণ রহমতও মাঝেমধ্যে সে কাজে অংশ নিয়েছে, হয়তো প্রয়োজনে, না-হয় বংশের শিক্ষার কারণে। কাম-কাজ না থাকলে অবসরে হাওয়াইল্যার ব্রিজে ডাকাতি করতে যেত। জায়গাটি ডাকাতির জন্য ভালো। উপজেলা সদর থেকে রাত দশটার এদিক-ওদিকে যারা চলাফেরা করেছে, তাদের অনেকের ডাকাতের কবলে পড়ার অভিজ্ঞতা আছে। একদিকে মৌজপুর অন্যদিকে মাধবপুর, দুটিকে যুক্ত করেছে হাওরের মাঝদিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা। রাস্তাটি তখন কাঁচা ছিল। ব্রিজটি অনেক পুরাতন। এর তল দিয়ে প্রায় সারাবছর নৌকা চলাচল করে। বর্ষায় চারদিক পানিতে ডুবে যায়। ডাকাতি করে নিরাপদে সরে পড়ার জন্য জায়গাটি বেশ সুবিধাজনক। রহমতরা বংশপরম্পরায় এই সুবিধা নিয়েছে। তবে এটি তার পেশা ছিল না। যদিও সাহস আর শক্তির জুতসই সমন্বয় তাকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছিল। ফলে দলের অভিজ্ঞরা তাকে পছন্দ করত এবং উৎসাহ দিত। তার শুরুটা হয়েছিল হাওয়াইল্যার ব্রিজ দিয়েই। এটি নিরাপদ। আশপাশে বাড়িঘর নেই। অপ্রস্তুত পথচারীর রিকশা বা টেম্পু আটকে সর্বস্ব লুট করে নৌকা যোগে কেটে পড়া। ধরা পড়ার সম্ভাবনা একেবারে কম। তবে প্রথমবারেই তার একটা বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি কম বয়সি মেয়ের অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা তাকে প্রায় আটকে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেন অভিজ্ঞ জয়নাল মিয়া। ডাকাতি করতে এসে দয়ামায়া দেখানো মানে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা। এই বিপদের সীমা নাই।

রহমত আলী বসে আছেন। দোকানদার চায়ের অফার করে, 'কাহা, চা খাইবায় নি?' মানুষের করুণায় তার জীবন চলে, চায়ের তৃষ্ণাও আছে; তবু তিনি বিনয়ের সাথে উপেক্ষা করেন চায়ের প্রস্তাব। তার মনোযোগ মানুষের আনাগোনার দিকে। সেদিনও অনেক মানুষ

জড়ো হয়েছিল, যেদিন ধরা পড়ল রহমত। শেষ রাতে ফুলতলি গ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে পালানোর সময় গ্রামবাসী তাদের তিনজনকে ধরে ফেলে। দলে ছিল বারো জন। সূর্যের আলো পূর্বদিকের শূন্য মাঠ পার হয়ে দেওয়ান বাড়ির চৌচালায় পৌঁছার আগেই মানুষের ঢল নামে বাংলা ঘরের সামনে, ডাকাত দেখার জন্য। কারো কারো কাছে এরা পরিচিত। তবে আজকে নতুন রূপে দেখে তারা অবাক হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রইছ উদ্দিন। তার বাবাও চেয়ারম্যান ছিলেন। চোর ধরে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা এলাকাবাসী এখনো গর্বের সাথে স্মরণ করে। তার ছেলে রইছ উদ্দিন। তিনি আসাতে সমবেত সবাই অপেক্ষা করছে কী বিচার হয় দেখার জন্য। বিচার করার প্রাথমিক কাজটা অবশ্য গ্রামবাসীরা করে ফেলেছে। বেদম মারধর করে প্রায় আধমরা করে পিঠমোড়া অবস্থায় বেঁধে রেখেছে। এসেই রইছ আন্তরিকতার সাথে বললেন, "আরে, 'কাউট্টা বান' দিয়া রাখছ, কেরে?" তার নির্দেশে রশির কঠিন বাঁধন একটু শিথিল হলো। কম বয়সি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী গৌরবর্ণের রহমত প্রবল নির্যাতনের পরও নেতিয়ে পড়েনি। অন্য দুজন বসার মতো অবস্থায় নেই। রহমত ভেবেছিল হয়তো পুলিশের হাতে তুলে দেবে, বছরখানেকের জেল হবে। তার পর বেরিয়ে আসবে। এই পথে আর না। প্রয়োজনে মুনি খাটবে, তবু ডাকাতি কখনো না। কিন্তু পিটিয়ে চোর মেরে ফেলা চেয়ারম্যানের ছেলে রায় ঘোষণা করলেন চমক জাগানো–কম বয়সি ডাকাতটার চোখ তুলে ফেলতে হবে। এইটা হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। সাথে সাথেই উল্লাসে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা। অপ্রত্যাশিত রায় শোনার বিস্ময় কাটার পরে রহমত যখন বুঝতে পারল সত্যি-সত্যি তার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন চিৎকার করে কাকুতি-মিনতি শুরু করল। তাতে অবশ্য বিচারকের এবং উপস্থিত জনতার খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। দুর্বল হৃদয়ের যারা তারা দূরে সরে গেল। তবে এই দৃশ্য দেখার মানুষের অভাব রইল না। অনেকদিন পরে এই অঞ্চলে এত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে চলেছে। কলেজ পড়ুয়া একজন চেয়ারম্যানের নিকট ডাকাতদের

পুলিশে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করে; আর বয়স্ক একজন, যিনি চোখে দেখেন একেবারে কম, বিনীত অনুরোধ জানান, যেন চোখ দুটি নষ্ট করা ছাড়া যেকোনো শাস্তি প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান অবশ্য এককথার মানুষ; রায় তিনি একবারই ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে এক ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবেন। রহমত তার কাছে বেশকিছু দিন গিয়েও ছিল। একদিন তাকে আর পাওয়া গেল না, তিনি অন্যত্র বদলি হলেন। সাথে তার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সমস্ত আশারও পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রথম প্রথম পাগলের মতো চিৎকার করত রহমত। দিনের প্রখর আলোয়, রাতে কুপির আগুনে তার ছয় বছরের মেয়েটির মুখ হাত দিয়ে ধরে, চোখের কাছে এনে সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে দেখতে চাইত। কিন্তু তার ইচ্ছার কোনো মূল্য জগতে কোথাও থাকল না। ডাকাত দলের লোকজন প্রথমদিকে যোগাযোগ রাখলেও একসময় সবাই দূরে সরে যায়। 'ডাকাইতের বউ' অপবাদ থেকে বাঁচতে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করলে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু হয়– মানুষের করুণার জীবন।

চল্লিশ বছর বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন রহমত আলী। মেয়ের হাত ধরে ধরে পথ চিনেছেন। পথেঘাটে মানুষের করুণা ভিক্ষা করেছেন। একদিন মেয়েটি বড় হয়ে যায়। যুবতি মেয়েকে নিয়ে পথ হাঁটতে তার পিতৃত্বে বাধে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবার একাকী পথ চলা। মেয়েটি ছিল তার চোখের মতো। তার দৃষ্টিতেই তিনি সকাল দুপুর রাত দেখতেন। সে চলে যাওয়াতে চোখের দায়িত্ব নিয়েছে শরীরের আর সব অঙ্গ। কত বিচিত্র জীবন! মানুষ এভাবে বেঁচে থাকতে পারে? রহমত ভাবেন। নিজের শক্তি তাকে মাঝেমধ্যে অবাক করে দেয়।

জোয়ান শক্ত মানুষটার শরীরে ভর করেছে বয়স। সকালের কুয়াশা সরে গিয়ে চমৎকার রোদ উঠেছে। দাফন করতে আসা নীরব প্রার্থনামুখী মানুষের জমায়েত খোলা মাঠটিকে একটি শান্ত সৌন্দর্য প্রদান করেছে। তবে এর কোনোটিই রহমতকে স্পর্শ করে না। তার